চ্যানেল আই'র ২২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের জন্য বিশেষ এ নিবন্ধটি লিখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও চ্যানেল আই পরিবারের কৃতজ্ঞতা।

পত্রিকা পড়ার গল্প

শেখ হাসিনা

ভোরে ঘুম থেকে উঠে একে একে সকলে জড়ো হতাম মায়ের শোবার ঘরে। হাতে চায়ের পেয়ালা, বিছানার উপর ছড়ানো-ছিটানো খবরের কাগজ... একজনের পর আরেকজন, এক-একটা খবর পড়ছে আর অন্যেরা মন দিয়ে শুনছে বা মতামত দিচ্ছে। কখনও কখনও তর্কও চলছে– কাগজে কী লিখল বা কী বার্তা দিতে চাচ্ছে? যার যার চিন্তা থেকে মতামত দিয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে জমে উঠছে সকালের চায়ের আসর আর খবরের কাগজ পড়া।

আমাদের দিনটা এভাবেই শুরু হতো। অন্ততঃ ঘন্টাতিনেক এভাবেই চলতো। আব্বা প্রস্তুত হয়ে যেতেন। আমরাও স্কুলের জন্য তৈরি হতাম। আব্বার অফিস এক মিনিটও এদিক-সেদিক হওয়ার জো নেই। সময়ানুবর্তিতা তাঁর কাছে থেকেই আমরা পেয়েছি।

সংবাদপত্র পড়া ও বিভিন্ন মতামত দেওয়া দেখে আব্বা একদিন বললেন: "বলতো? কে কোন খবরটা বেশি মন দিয়ে পড়?"

আমরা খুব হকচকিয়ে গেলাম। কেউ কোন কথা বলতে পারি না। আমি, কামাল, জামাল, খোকা কাকা, জেনী সকলেই সেখানে। এমনকি ছোট্ট রাসেলও আমাদের সাথে। তবে সে পড়ে না, কাগজ কেড়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে।

আমরা কিছু বলতে পারছি না দেখে আব্বা নিজেই বলে দিলেন– কে কোন খবরটা নিয়ে আমরা বেশি আগ্রহী। আমরা তো হতবাক। আব্বা এত খেয়াল করেন! মা সংবাদপত্রের ভিতরের ছোট ছোট খবরগুলি, বিশেষ করে সামাজিক বিষয়গুলি, বেশি পড়তেন। আর কোথায় কী ঘটনা ঘটছে তা-ও দেখতেন। কামাল স্পোর্টসের খবর বেশি দেখতো। জামালও মোটামুটি তাই। আমি সাহিত্যের পাতা, আর সিনেমার সংবাদ নিয়ে ব্যস্ত হতাম। এভাবে একেকজনের একেক দিকে আগ্রহ।

যে সময়ের কথা বললাম, সেটা অনেক পরের কথা। আমার ও কামালের ছোটবেলা কেটেছে টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে। ঢাকা থেকে যেতে সময় লাগতো দুই রাত একদিন। অর্থাৎ সন্ধ্যার স্টিমারে চড়লে পরের দিন স্টিমারে কাটাতে হত। এরপর শেষ রাতে স্টিমার পাটগাতি স্টেশনে থামতো। সেখান থেকে নৌকার দুই-আড়াই ঘণ্টার নদীপথ পেরিয়ে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে পৌঁছানো যেত।

কাজেই সেখানে কাগজ পৌঁছাত অনিয়মিতভাবে। তখন কাগজ বা পত্রিকা পড়া কাকে বলে তা শিখতে পারিনি। তবে একখানা কাগজ আসতো আমাদের বাড়িতে। তা পড়ায় বড়দের যে প্রচণ্ড আগ্রহ তা দেখতাম।

ঢাকায় আমরা আসি ১৯৫৪ সালে। তখন রাজনীতির অনেক চড়াই-উৎরাই চলছে। আব্বাকে তো আমরা পেতামই না। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আবার মন্ত্রীত্বও পেলেন। তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে গভীর রাতে ফিরতেন। আমরা তখন ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে উঠে আমি আর কামাল স্কুলে চলে যেতাম। মাঝেমধ্যে যখন দুপুরে খেতে আসতেন, তখন আব্বার দেখা পেতাম। ঐ সময়টুকুই আমাদের কাছে ভীষণ মূল্যবান ছিল। আব্বার আদর-ভালোবাসা অল্প সময়ের জন্য পেলেও আমাদের জন্য ছিল তা অনেক পাওয়া।

বাংলার মানুষের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবনের সবটুকু সময়ই যেন বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য নিবেদিত ছিল।

এর পরই কারাগারে বন্দি তিনি। বাইরে থাকলে মানুষের ভিড়ে আমরা খুব কমই আব্বাকে কাছে পেতাম। আর কারাগারে যখন বন্দি থাকতেন তখন ১৫-দিনে মাত্র এক ঘন্টার জন্য দেখা পেতাম। এইতো ছিল আমাদের জীবন!

আমার মা আমাদের সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতেন তাঁর স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে। আর আমার দাদাদাদী ও চাচা শেখ আবু নাসের– আমাদের সব আবদার তাঁরা মেটাতেন। যা প্রয়োজন তিনিই এনে দিতেন। আর আব্বার ফুফাতো ভাই– খোকা কাকা– সব সময় আমাদের সাথে থাকতেন। আমাদের স্কুলে নেওয়া, আব্বার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সরকার যে মামলা দিত তার জন্য আইনজীবীদের বাড়ি যাওয়া– সবই মার সাথে সাথে থেকে খোকা কাকা সহযোগিতা করতেন।

তবে আমার মা পড়াশোনা করতে পছন্দ করতেন। আমার দাদা বাড়িতে নানা ধরনের পত্রিকা রাখতেন। আব্বার লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে দাদার পত্রিকা কেনা ও পড়ার কথা উল্লেখ আছে। তখন থেকেই আব্বার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস। আর আমরা তাঁর কাছ থেকেই পত্রিকা পড়তে শিখেছি।

পত্রিকার সঙ্গে আব্বার একটা আত্মিক যোগসূত্র ছিল। আব্বা যখন কলকাতায় পড়ালেখা করছিলেন, তখনই একটা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জনাব হাশেম এ পত্রিকার তত্ত্বাবধান করতেন এবং তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। পত্রিকাটির প্রচারের কাজে আব্বা যুক্ত ছিলেন। মিল্লাত ও ইত্তেহাদ নামে ২টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির সঙ্গেও আব্বা জড়িত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে 'নতুন দিন' নামে আরেকটি পত্রিকার সঙ্গে আব্বা সম্পৃক্ত হন। জুলফিকার (পুরো নাম স্মরণে নেই) নামে এক প্রবীণ সাংবাদিক এর সম্পাদক হয়েছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আর্থিক সহায়তায় 'ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রিকার সঙ্গেও আব্বা সংযুক্ত ছিলেন এবং কাজ করেছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পর আব্বা ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৮ সালে মার্শাল 'ল জারি করে আইয়ুব খান। আব্বা গ্রেফতার হন। ১৯৬০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তিনি আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। কারণ, এ সময় তাঁর রাজনীতি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল।

এমনকি ঢাকার বাইরে যেতে গেলেও থানায় খবর দিয়ে যেতে হতো, গোয়েন্দা সংস্থাকে জানিয়ে যেতে হতো। তবে আমাদের জন্য সে সময়টা আব্বাকে কাছে পাওয়ার এক বিরল সুযোগ এনে দেয়। খুব ভোরে উঠে আব্বার সাথে প্রাতঃভ্রমণে বের হতাম। আমরা তখন সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে থাকতাম। রমনা পার্ক তখন তৈরি হচ্ছে। ৭৬ নম্বর সেগুনবাগিচার সেই বাসা থেকে হেঁটে পার্কে যেতাম। সেখানে একটা ছোট চিড়িয়াখানা ছিল। কয়েকটা হরিণ, ময়ূর পাখিসহ কিছু জীবজন্তু ছিল তাতে।

বাসায় ফিরে এসে আব্বা চা ও খবরের কাগজ নিয়ে বসতেন। মা ও আব্বা মিলে কাগজ পড়তেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

ইত্তেফাক পত্রিকার 'কচিকাঁচার আসর' নামে ছোটদের একটা অংশ প্রতি সপ্তাহে বের হতো। সেখানে জামাল আহমেদ নামে একজন 'জাপানের চিঠি' বলে একটা লেখা লিখতেন। ধাঁধাঁর আসর ছিল। আমি ধাঁধাঁর আসরে মাঝেমধ্যে ধাঁধাঁর জবাব দিতাম। কখনও কখনও মিলাতেও পারতাম।

পত্রিকাগুলিতে তখন সাহিত্যের পাতা থাকতো। বারান্দায় বসে চা ও কাগজ পড়া প্রতিদিনের কাজ ছিল। আমার মা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়তেন। ভিতরে যারা কাজ করত বা অন্য বন্দিরা থাকত, তাদের কাছ থেকেই অনায়াসে তিনি খবরগুলি পেতেন।

আমার মা যখন সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তিনি আব্বাকে অবহিত করতেন। আর আব্বা যেসব দিক-নির্দেশনা দিতেন, সেগুলি তিনি দলের নেতাকর্মীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। বিশেষ করে ছয়-দফা দেওয়ার পর যে আন্দোলনটা গড়ে উঠে, তার সবটুকু কৃতিত্বই আমার মায়ের। তাঁর ছিল প্রখর স্মরণশক্তি।

বন্দি থাকা অবস্থায় পত্রিকা যে কত বড় সহায়ক সাথী তা আমি নিজেও জানি। ২০০৭-০৮ সময়ে যখন বন্দি ছিলাম আমি নিজের টাকায় ৪টি পত্রিকা কিনতাম। তবে নিজের পছন্দমত কাগজ নেওয়া যেতো না। সরকার ৪টা পত্রিকার নাম দিয়েছিল, তাই নিতাম। কিছু খবর তো পাওয়া যেত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেটে আমার আব্বা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নির্মমভাবে নিহত হন। সেই সাথে আমার মা, তিন ভাইসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়।

আমি ও আমার ছোট বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলাম। সব হারিয়ে রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে রিফিউজি হিসেবে যখন পরাশ্রয়ে জীবনযাপন করি, তখনও পত্রিকা যোগাড় করেছি এবং নিয়মিত পত্রিকা পড়েছি।

১৯৮০ সালে দিল্লী থেকে লন্ডন গিয়েছিলাম। রেহানার সাথে ছিলাম বেশ কিছুদিন। তখন যে পাড়ায় আমরা থাকতাম, ঐ পাড়ার ৮-১০জন ছেলেমেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতাম। ছুটি হলে সকলকে নিয়ে আবার ঘরে পৌঁছে দিতাম। বাচ্চা প্রতি এক পাউণ্ড করে মজুরি পেতাম। ঐ টাকা থেকে সর্বপ্রথম যে খরচটা আমি দুপুরে খাবার খেয়ে মা পত্রিকা ও ডাকবাক্সের চিঠিপত্র নিয়ে বসতেন। আমাদের বাসায় নিয়মিত 'বেগম' পত্রিকা রাখা হতো। 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফি', 'লাইফ' এবং 'রিডার্স ডাইজেস্ট'– কোনটা সাপ্তাহিক, কোনটা মাসিক আবার কোনটা বা ত্রৈমাসিক– এই পত্রিকাগুলি রাখা হতো। 'সমকাল' সাহিত্য পত্রিকাও বাসায় রাখা হতো। মা খুব পছন্দ করতেন। 'বেগম' ও 'সমকাল' এ দুটোর লেখা মায়ের খুব পছন্দ ছিল।

সে সময়ে সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করলেন আব্বা। সেগুনবাগিচায় একটা জায়গা নিয়ে সেখানে একটা ট্রেডেল মেশিন বসানো হলো। সেখান থেকে 'বাংলার বাণী' প্রকাশিত হতো। মণি ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা'য় পড়তেন। তাঁকেই কাগজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬২ সালে আব্বা আবার গ্রেফতার হন। আমরা তখন ধানমন্ডির বাসায় চলে এসেছি। কারাগারে আব্বা যখন বন্দি থাকতেন, বাইরের খবর পাওয়ার একমাত্র উপায় থাকতো খবরের কাগজ। কিন্তু যে পত্রিকা দেওয়া হতো সেগুলি সেন্সর করে দেওয়া হতো।

বন্দি থাকা অবস্থায় পত্রিকা পড়ার যে আগ্রহ তা আপনারা যদি আমার আব্বার লেখা "কারাগারের রোজনামচা" পড়েন তখনই বুঝতে পারবেন। একজন বন্দির জীবনে, আর যদি সে হয় রাজবন্দি, তাঁর জন্য পত্রিকা কত গুরুত্বপূর্ণ– তাতে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও বাইরের খবরাখবর পেতে আব্বার খুব বেশি বেগ পেতে হতো না, কারণ জেলের প্রতিদিন করতাম, তা হলো কর্নারশপ থেকে একটা পত্রিকা কেনা। বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফেরার সময় পত্রিকা, রুটি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাসায় ফিরতাম। তখন একটা পত্রিকা হাতে না নিলে মনে হত সমস্ত দিনটাই যেন 'পানসে' হয়ে গেছে।

সব সময়ই আব্বা ও মায়ের কথা চিন্তা করি। তাঁরা দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভাবতে শিখিয়েছেন। মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত করেছেন। সাদাসিধে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে উন্নততর সুচিন্তা করতে শিখিয়েছেন। মানবপ্রেম ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করেছেন। সে আদর্শ নিয়ে বড় হয়েছিলাম বলেই আজ দেশসেবার মতো কঠিন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হচ্ছি। প্রতিদিনের রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা নিতে পারছি এবং তা বাস্তবায়ন করছি। যার সুফল বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করছে।

সমালোচনা, আলোচনা রাজনৈতিক জীবনে থাকবেই। কিন্তু সততা-নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করলে, নিজের আত্মবিশ্বাস থেকে সিদ্ধান্ত নিলে, সে কাজের শুভ ফলটা মানুষের কাছেই পৌঁছবেই।

গণমাধ্যম সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। আমি সরকার গঠন করার পর সব সরকারি পত্রিকা ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেই।

যদিও সরকারিকরণের বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন এবং সরকারিকরণ নিয়ে যাঁরা খুবই সমালোচনা করতেন, তাঁরাই আবার যখন বেসরকারিকরণ করলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। আন্দোলন, অনশনও হয়েছে।

আমি মাঝেমধ্যে চিন্তা করি– যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যে কয়টা পত্রিকা ছিল তা সরকারিকরণ করে সব সাংবাদিকের চাকরি সরকারিভাবে দেওয়া হল, বেতনও সরকারিভাবে পেতে শুরু করলেন তাঁরা। অথচ আবার তাঁরাই সকল সুযোগসুবিধা নিয়েও আব্বার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা শুরু করলেন।

আবার আমি যখন সব সরকারি পত্রিকা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলাম, তখন কেন বেসরকারি করছি তা নিয়ে সমালোচনা, আন্দোলন, অনশন সবই হল। কেন? এর উত্তর কেউ দেবেন না, আমি জানি।

১৯৯৬ সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখন বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা পত্রিকা ছিল। সেগুলিরও নিয়ন্ত্রণ হত বিশেষ জায়গা থেকে। সরকারি মালিকানায় রেডিও, টেলিভিশন। বেসরকারি খাতে কোন টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও ছিল না।

আমি উদ্যোগ নিয়ে বেসরকারি খাত উন্মুক্ত করে দিলাম। এ ক্ষেত্রে আমার দুটি লক্ষ্য ছিল– একটা হলো "কর্মসংস্থান" সৃষ্টি করা, আরেকটা হলো আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ– বর্তমান যুগের সাথে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কৃতি-শিল্পের সম্মিলন ঘটানো। যাতে আধুনিকতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, তৃণমূলের মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারে।

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছিলাম। ডিজিটাল ডিভাইস আমাদের কর্মজীবনে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনাভাইরাসের মোকাবেলা করতে সহায়তা করছে। সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার সুযোগ পাচ্ছি।

১৯৯৬ সালেই মোবাইল ফোন বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আজ সকলের হাতে মোবাইল ফোন।

বাংলাদেশে সিনেমা শিল্পের শুরু হয়েছিল আব্বা'র হাত ধরে। এ শিল্পকে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন করে বাংলাদেশের মানুষের চিত্ত বিনোদনের ব্যাপক সুযোগ হয়েছে। আবার সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনেও ভূমিকা রাখতে পারে এ শিল্প।

বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দিন যাপন করছি। আমি আশাবাদী এ কালোমেঘ শিগগিরই কেটে যাবে, উদয় হবে আলোকোজ্জ্বল নতুন সূর্যের। সকলের জীবন সফল হোক, সুন্দর হোক। সবাই সুস্থ থাকুন, এই কামনা করি।

● *প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' এর বাইশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি দর্শকশ্রোতা, কলাকুশলী, শুভানুধ্যায়ীসহ চ্যানেল আই পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণমাধ্যম জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। গণমাধ্যম সময়ের কথা বলে, অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে পথ দেখায়। গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। গণমাধ্যম সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখে। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে দেশের গণমাধ্যমসমূহ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি গণমাধ্যমসমূহ দেশ ও জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

প্রতিষ্ঠার পর হতে চ্যানেল আই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে আসছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই' এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এছাড়া পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নেও চ্যানেলটি কাজ করে যাচ্ছে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি দেশে-বিদেশে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে চ্যানেল আই অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাবে– এ প্রত্যাশা করছি।

আমি 'চ্যানেল আই' এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই তার পথচলার ২১ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ২২ বছরে পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাঙ্ক্ষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত দেশে গণমাধ্যম আজ উন্নয়নের সহযাত্রী। দেশ মাতৃকার জন্য গণমাধ্যমের এ ভূমিকা থাকুক অব্যাহত।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একইসাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতর থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চানেল আই এর উৎকর্ষের স্বাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

সামনে এগিয়ে যাই

ফরিদুর রেজা সাগর

বাইশ বছরে এসে আমাদের বলতে হচ্ছে- সামনে এগিয়ে যাই। অথচ বয়স যখন একুশ পার হলো তখন ভাবার কথা ছিল পেছনে ফিরে তাকানোর আর অবকাশ নেই। অসাধারণ গতি নিয়ে ছুট দেয়ার কথা ছিল। রঙিন পৃথিবীটা আরো বর্ণিল করে তোলার কথা ছিল।

এবার হঠাৎ করেই পৃথিবী পাল্টে ফেলল তার চেহারা। মানুষের হাতে অনেক কিছুই আর রইল না। গতি নেমে গেল। করোনার আক্রমণে স্তব্ধ হয়ে গেল সব। সমস্ত কিছু অচল অচল ভাব। এক অন্যরকম পৃথিবী। করোনার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ। এমন সব জিনিস থেমে গেল বা আমরা থামাতে বাধ্য হলাম যা কেবল জুল ভার্নের সায়েন্স ফিকশন গল্প-উপন্যাসে সম্ভব। ভবিষ্যতে এই সময়কাল নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হবে, চলচ্চিত্র হবে। যা দেখে বা পড়ে মনে হবে এই রকম অবিশ্বাস্য সময়ও মানুষ পার করেছে। এই নিশ্চল স্থবির সময়েও যেটি চালু আছে সেটি হচ্ছে স্বপ্ন। যেটি এখনও গতিস্মান সেটি হচ্ছে বিশ্বাসের শক্তি।

মানুষ সেই প্রাণী যে জানে জীবন মানে অবশ্যই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। একই সঙ্গে বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করাটাও সবচেয়ে বড় অর্জনের বিষয়। এই আনন্দের জন্য, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য যুদ্ধ করছে চ্যানেল আই। যত প্রতিকূলতাই আসুক, সময় যত কুয়াশাচ্ছন্নই হোক সদা সর্বদা আপনাদের সাথে নিয়ে বলব, সামনে এগিয়ে যাই।

আমাদের এই বিশেষ ক্রোড়পত্রের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পত্রিকা ও মিডিয়ার সঙ্গে তার ও তার পরিবারের সম্পর্ক উল্লেখ করে একটি দীর্ঘ লেখা দিয়েছেন। তার জন্য আমাদের নিরন্তর শুভ ও কল্যাণ কামনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নতুন পৃথিবীর পথে

শাইখ সিরাজ

পৃথিবীতে রূপান্তর, বিবর্তন, উন্নয়ন কিংবা পালাবদল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে আমরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোই পুরছি। শত বছর আগেও মানুষ একথাই ভেবেছিল। শত বছর পরেও এভাবেই ভাববে। আজ আমরা টেলিভিশনের কন্টেন্ট প্রচলিত টিভি স্ক্রিনের বাইরেও ইউটিউব, ফেইসবুক, ইন্সট্রাগ্রামে দেখছি। সব ভিডিও কন্টেন্টই কিন্তু টেলিভিশনের সফটওয়্যার উৎপাদন ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে আসছে। দিনশেষে যত্ন, পরিশ্রম আর সাধনা দিয়ে তৈরি কন্টেন্টই জয় লাভ করছে। টেলিভিশনের বিজয়টা এখানেই।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের লক্ষ ছিল সেরা কন্টেন্ট তৈরির। সেখানে আমরা অবিচল ছিলাম। এখনও আছি। আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ ও সুস্থ তথ্যপ্রবাহনির্ভর সংবাদ, সুস্থ বিনোদন, গণতন্ত্র ও সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চা, দেশের উন্নয়ন অর্থনীতির শেকড় কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, আমাদের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবনবোধের জায়গাগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরছি। এগুলোই প্রাত্যহিক জীবনধারার সবচেয়ে শক্তিশালী উপজীব্য হিসেবে ধরা দিচ্ছে।

আজ বাইশ বছরে পৌঁছে একজন তরুণ আগামীর পৃথিবীটা যেভাবে দেখতে চাইছে, আমরাও নতুন পৃথিবীর পথে সাফল্য ও উৎকর্ষের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছি।

বলছি, বাইশে চ্যানেল আই, সামনে এগিয়ে যাই। এবারের জন্মদিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার গণমাধ্যম চিন্তা আমাদের এই ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তার প্রতি সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা দেশ বিদেশের সকল দর্শক শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি।

পরিচালক ও বার্তা প্রধান

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ